অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিশোর রচনা সমগ্র

নির্বাচিত অংশ

দ্বিতীয় খণ্ড

সংকলক

অশোককুমার মিত্র

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

॥ সূচিপত্র ॥

গল্প ও উপন্যাস	১৩ - ৩০২
ক্ষীরের পুতুল	১৫
ভূতপত্‌রীর দেশ	৩৩
নালক	৭৫
বুড়ো আংলা	৯৯
মাসি	১৯৫
বাদশাহি গল্প	২২৩
চট্‌জলদি কবিতা	২৫৯
চৈতন চুটকি	২৯৫
পুঁথি	৩০৩ - ৪৩৬
মারুতির পুঁথি	৩০৫
মহাবীরের পুঁথি	৩৭৫
স্মৃতিকথা	৪৩৭ - ৫৪০
জোড়াসাঁকোর ধারে	৪৩৯

যাত্রাপালা ৫৪১ - ৮০৮
মউর ছালের পালা ৫৪৩
কঞ্জুষের পালা ৫৫৭
বেণুকুঞ্জের পালা ৫৭৩
জাবালির পালা ৫৮৫
ফসকান পালা ৬০৯
দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা ৬১৭
কাক ও পনির পালা ৬৩১
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী পালা ৬৩৭
গোল্ডেন-গুজ পালা ৬৪৫
ঘোড়া হাটের পালা ৬৫৩
অরণ্যকাণ্ড পালা ৬৭১
দুঃসহ পালা ৭২৩
উড়নচণ্ডীর পালা ৭৩৩
গজ-কচ্ছপের পালা ৭৫৯
লম্বকর্ণ পালা ৭৬৭
পুত্‌লীর পালা ৭৯১
বৃক ও মেষ পালা ৮০১

বিবিধ ৮০৯ - ৮৫২
রাসধারী ৮১১
আইনে চীন-ই ৮২৭
গঙ্গাফড়িং ৮৩১
আলোয় কালোয় ৮৩২
বড়ো রাজা ছোটো রাজার গল্প ৮৩৪
বাবুই পাখির ওড়ন বৃত্তান্ত ৮৩৬
সূয্যিমামার ঘর ৮৪৭

॥ সম্পাদকের কথা ॥

অবনীন্দ্রনাথ বাংলা শিশুসাহিত্যের এক অবিকল্প রূপকার। যদিও চিত্রশিল্পে, সংগীত চর্চায় তাঁর প্রাথমিক আগ্রহ ছিল, তবু তাঁর রবিকাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় একদিন সাহস ভরে 'শকুন্তলা' লিখে ফেললেন। কালিদাসের কাব্য নির্ভর এ রচনার স্তবকে স্তবকে এক একটি ছবি যেন ফুটে উঠল। একটি রচনায় আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল। অতঃপর লিখলেন ক্ষীরের পুতুল—তাঁর কাকিমা মৃণালিনী দেবী সংগৃহীত বাংলার রূপকথার একটি গল্প ছিল এ উপাখ্যানের মূল সূত্র। তারপরে রাজকাহিনী, তারপরে ভূতপত্রীর দেশ, নালক, খাজাঞ্চির খাতা, বুড়ো আংলা, আলোর ফুলকি অসংখ্য পুথি ও পালাগান লিখেছেন মনের আনন্দে। তাঁর লেখায় রয়েছে কল্পনার উদ্দাম উল্লাস, ভাষার অনুপম কারুকাজ, আশ্চর্য লোকজ শব্দের ব্যবহার আর বিস্ময়কর সব ছবি, ছবির পরে ছবি যা ছোটোদের মনে অসম্ভবের ছন্দ সঞ্চারিত করে দেয়। তিনি মুখে মুখে রচনা করেছিলেন ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারে—যাকে কথা শিল্প বলে অভিহিত করতে আমাদের মনে কখনও দ্বিধা জন্মায় না। নিজেও আপন কলমে একটি ছোটো স্মৃতিকাহিনি রচনা করেছেন—আপনকথা —তাতে যেমন কলমের আঁচড়ে ছবি এঁকেছেন তেমনি টাইপ সাজিয়েও ছবি ফুটিয়েছেন।

আমরা অবনীন্দ্রনাথের কিশোর রচনাবলি প্রকাশ করেছি দুখণ্ডে। তাঁর অসংখ্য রচনা অবশ্য পাঠ্য রচনাগুলি নির্বাচিত করে ছোটোদের হাতে তুলে দিচ্ছি। তাঁর বিচিত্রধর্মী রচনাবলি দুখণ্ডে এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যাতে পাঠক প্রতি খণ্ডেই বিভিন্ন ধরনের রচনার স্বাদ পান।

অবনীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃজন বিষয়ে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে দিয়েছেন অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। রচনাবলি সংকলনে ও প্রকাশনায় যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ।

আশাকরি, আমাদের অন্যান্য কিশোর সাহিত্য সংগ্রহের মতো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সমগ্র ছোটোদের কাছে আকর্ষণীয় হবে।

জানুয়ারি ২০১৩

অশোককুমার মিত্র

ক্ষীরের পুতুল

এক রাজার দুই রানি, দুয়ো আর সুয়ো। রাজবাড়িতে সুয়োরানির বড়ো আদর, বড়ো যত্ন। সুয়োরানি সাতমহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুয়োরানি মালা গাঁথেন সাত সিন্দুক-ভরা সাত-রাজার ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুয়োরানি রাজার প্রাণ।

আর দুয়োরানি—বড়োরানি, তাঁর বড়ো অনাদর, বড়ো অযত্ন। রাজা বিষ নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন—ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন—বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন—ছেঁড়া কাঁথা। দুয়োরানির ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।

সুয়োরানি—ছোটোরানি, তাঁরই ঘরে রাজা বারোমাস থাকেন।

একদিন রাজা রাজমন্ত্রীকে ডেকে বললেন—মন্ত্রী, দেশবিদেশ বেড়াতে যাব, তুমি জাহাজ সাজাও।

রাজার আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখানা জাহাজ সাজাতে সাত মাস গেল। ছ'খানা জাহাজে রাজার চাকর-বাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া-ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা নিজে যাবেন।

মন্ত্রী এসে খবর দিলেন—মহারাজ, জাহাজ প্রস্তুত।

রাজা বললেন—কাল যাব।

মন্ত্রী ঘরে গেলেন।

ছোটোরানি—সুয়োরানি রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিলেন, সাত সখী সেবা করছিল, রাজা সেখানে গেলেন। সোনার পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোটোরানিকে বললেন—রানি, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কী আনব?

রানি ননীর হাতে হিরের চুড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন—হিরের রঙ বড়ো সাদা, হাত যেন শুধু দেখায়। রক্তের মতো রাঙা আট-আট গাছা মানিকের চুড়ি পাই তো পরি।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানি, মানিকের দেশ থেকে মানিকের চুড়ি আনব।

রানি রাঙা পা নাচিয়ে নাচিয়ে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে বললেন—এ নূপুর ভালো বাজে না। আগুনের বরন নিরেট সোনার দশ গাছা মল পাই তো পরি।

রাজা বললেন—সোনার দেশ থেকে তোমার পায়ের সোনার মল আনব।

রানি গলার গজমতি হার দেখিয়ে বললেন—দেখ রাজা, এ মুক্তো বড়ো ছোটো, শুনেছি কোন দেশে পায়রার ডিমের মতো মুক্তো আছে, তারই একছড়া হার এনো।

রাজা বললেন—সাগরের মাঝে মুক্তোর রাজ্য, সেখান থেকে গলার হার আনব। আর কী আনব রানি?

তখন আদরিনী সুয়োরানি সোনার অঙ্গে সোনার আঁচল টেনে বললেন—মা গো, শাড়ি নয় তো বোঝা! আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পাই তো পরে বাঁচি।

রাজা বললেন—আহা, আহা, তাই তো রানি, সোনার আঁচলে সোনার অঙ্গে ছড় লেগেছে, ননীর দেহে ব্যথা বেজেছে। রানি, হাসিমুখে বিদায় দাও, আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি আনিগে।

ছোটোরানি হাসিমুখে রাজাকে বিদায় করলেন।

রাজা বিদায় হয়ে জাহাজে চড়বেন—মনে পড়ল দুখিনি বড়োরানিকে।

দুয়োরানি—বড়োরানি, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কাঁদছেন, রাজা সেখানে এলেন।

ভাঙা ঘরের ভাঙা দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন—বড়োরানি, আমি বিদেশ যাব। ছোটোরানির জন্যে হাতের বালা, গলার মালা, পায়ের মল, পরনের শাড়ি আনব। তোমার জন্যে কী আনব? বলে দাও যদি কিছু সাধ থাকে।

রানি বললেন—মহারাজ, ভালোয় ভালোয় তুমি ঘরে এলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। তুমি যখন আমার ছিলে তখন আমার সোহাগও অনেক ছিল, সাধও অনেক ছিল। সোনার শাড়ি অঙ্গে পরে সাতমহল বাড়িতে হাজার হাজার আলো জ্বালিয়ে সাতশো সখীর মাঝে রানি হয়ে বসবার সাধ ছিল, সোনার পিঞ্জরে শুক-শারীর পায়ে সোনার নূপুর পরিয়ে দেবার সাধ ছিল। মহারাজ; অনেক সাধ ছিল, অনেক সাধ মিটেছে। এখন আর সোনার গহনায় সোনার শাড়িতে কী কাজ? মহারাজ, আমি কার সোহাগে হিরের বালা হাতে পরব? মোতির মালা গলায় দেব। মানিকের সিঁথি মাথায় বাঁধব? মহারাজ, সেদিন কি আর আছে! তুমি সোনার গহনা দেবে, সে সোহাগ তো ফিরে দেবে না! আমার সে সাতশো দাসী সাতমহল বাড়ি তো ফিরে দেবে না! বনের পাখি এনে দেবে কিন্তু, মহারাজ, সোনার খাঁচা তো দেবে না! ভাঙা ঘরে সোনার গহনা চোর-ডাকাতে লুটে নেবে, ভাঙা খাঁচায় বনের পাখি কেন ধরা দেবে? মহারাজ, তুমি যাও, যাকে সোহাগ দিয়েছ তার সাধ মেটাওগে, ছাই সাধে আমার কাজ নেই।

রাজা বললেন—না রানি, তা হবে না, লোকে শুনলে নিন্দে করবে। বলো তোমার কী সাধ?

রানি বললেন—কোন্ লাজে গহনার কথা মুখে আনব? মহারাজ, আমার জন্যে পোড়ারমুখ একটা বাঁদর এনো!

রাজা বললেন—আচ্ছা রানি, বিদায় দাও।

তখন বড়োরানি—দুয়োরানি ছেঁড়া কাঁথায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজাকে বিদায় দিলেন। রাজা গিয়ে জাহাজে চড়লেন।

সন্ধ্যাবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীল জল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিম মুখে ভেসে গেল।

ভাঙা ঘরে দুয়োরানি নীল সাগরের পারে চেয়ে, ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে রইলেন। আর আদরিণী সুয়োরানি সাতমহলা অন্তঃপুরে, সাতশো সখীর মাঝে, গহনার কথা ভাবতে ভাবতে, সোনার পিঞ্জরে সোনার পাখির গান শুনতে শুনতে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজাও জাহাজে চড়ে দুঃখিনী বড়োরানিকে ভুলে গেলেন। বিদায়ের দিনে ছোটোরানির সেই হাসি হাসি মুখ মনে পড়ে আর ভাবেন—এখন রানি কী করছেন? বোধ হয় চুল বাঁধছেন। এবার রানি কী করছেন? বুঝি রাঙা পায়ে আলতা পরছেন। এবার রানি সাত মালঞ্চে ফুল তুলছেন, এবার বুঝি সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুলে রানি মালা গাঁথছেন আর আমার কথা ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে বুঝি দুই চক্ষে জল এল, মালা আর গাঁথা হল না। সোনার সুতো, ফুলের সাজি পায়ের কাছে পড়ে রইল; বসে বসে সারা রাত কেটে গেল, রানির চোখে ঘুম এল না।

সুয়োরানি—ছোটোরানি রাজার আদরিণী, রাজা তারই কথা ভাবেন। আর বড়োরানি রাজার জন্যে পাগল, তাঁর কথা একবার মনেও পড়ে না।

এমন করে জাহাজে দেশ-বিদেশে রাজার বারো-মাস কেটে গেল।

তেরো মাসে রাজার জাহাজ মানিকের দেশে এল।

মানিকের দেশে সকলই মানিক। ঘরের দেওয়াল মানিক, ঘাটের শান মানিক, পথের কাঁকর মানিক। রাজা সেই মানিকের দেশে সুয়োরানির চুড়ি গড়ালেন। আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, পরলে মনে হয় গায়ের রক্ত ফুটে পড়ছে।

রাজা সেই মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে এলেন। সেই সোনার দেশে স্যাকরার দোকানে নিরেট সোনার দশগাছা মল গড়ালেন। মল জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিন্‌কি, বাজতে লাগল যেন বীণার ঝংকার—মন্দিরার রিনি-রিনি।

রাজা মানিকের দেশে মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে এলেন।

সে দেশে রাজার বাগানে দুটি পায়রা। তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সন্ধ্যাবেলায় সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, সকাল বেলায় ফেলে দেন।

দাসীরা সেই বাসি মুক্তোর হার এক জাহাজ রুপো নিয়ে বাজারে বেচে আসে।

রাজা এক জাহাজ রুপো দিয়ে সুয়োরানির গলায় দিতে সেই মুক্তোর এক ছড়া হার কিনলেন।

তারপর মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর হার গাঁথিয়ে, ছ-মাস পরে রাজা এক দেশে এলেন। সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারা রাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ-মাস যায়। রাজকন্যে একটি দিন সেই আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দিরে মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজা করেন। ঘরে এসে শাড়ি ছেড়ে দেন, দাসীরা যার কাছে সাত জাহাজ সোনা পায় তার কাছে শাড়ি বেচে। রাজা সাত জাহাজ সোনা দিয়ে আদরিণী সুয়োরানির শখের শাড়ি কিনলেন।

তারপর আর ছ-মাসে রাজার সাতখানা জাহাজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ছোটোরানির মানিকের চুড়ি, সোনার মল, মুক্তোর মালা, সাধের শাড়ি নিয়ে দেশে এল। তখন রাজার মনে পড়ল বড়োরানি বাঁদর চেয়েছেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রীবর, বড়ো ভুল হয়েছে। বড়োরানির বাঁদর আনা হয়নি, তুমি একটা বাঁদরের সন্ধানে যাও।

রাজমন্ত্রী একটা বাঁদরের সন্ধানে চলে গেলেন। আর রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে, ছোটোরানির সাধের গহনা শখের শাড়ি নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

ছোটোরানি সাত-মহল বাড়ির সাত-তলার উপরে সোনার আয়না সামনে রেখে, সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন, কাজল-লতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরছেন, রাঙা পায়ে আলতা দিচ্ছেন, সখীরা ফুলের থালা নিয়ে, পানের বাটা নিয়ে রাজরানি ছোটোরানির সেবা করছে—রাজা সেখানে এলেন।

স্ফটিকের সিংহাসনে রানির পাশে বসে বললেন—এই নাও, রানি। মানিকের দেশে মানিকের ঘাট, মানিকের বাট—সেখান থেকে হাতের চুড়ি এনেছি। সোনার দেশে সোনার ধুলো, সোনার বালি—সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি। মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দুটি পাখি মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সেই মুক্তোর হার গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, ভোরের বেলায় ফেলে দেন। রানি, তোমার জন্যে সেই মুক্তোর হার এনেছি। রানি, এক দেশে রাজার মেয়ে, এক-খী রেশমে সাত-খী সুতো কেটে নিশুতি রাতে ছাদে বসে ছ-টি মাসে—একখানি শাড়ি বোনে, এক দিন পরে পুজো করেন, ঘরে এসে ছেড়ে দেন। রানি, আমি সেই রাজার মেয়ের দেশ থেকে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে রাজকন্যার হাতে বোনা শাড়ি এনেছি। তুমি একবার চেয়ে দেখো! পৃথিবী খুঁজে গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, একবার পরে দেখো।

রানি তখন দু-হাতে আটগাছা চুড়ি পরলেন; মানিকের চুড়ি রানির হাতে ঢিলে হল, হাতের চুড়ি কাঁধে উঠল।

রানি তখন দু-পায়ে দশ-গাছা মল পরলেন; রাঙা পায়ে সোনার মল আলগা হল, দু-পা যেতে দশ গাছা মল শানের উপর খসে পড়ল। রানি মুখ ভার করে মুক্তোর হার গলায় পরলেন; মুক্তোর দেশের মুক্তোর হার রানির গলায় খাটো হল, হার পরতে গলার মাস কেটে গেল। রানি ব্যথা পেলেন।

সাত-পুরু করে শখের শাড়ি অঙ্গে পরলেন; নীল রেশমের নীল শাড়ি হাতে বহরে কম পড়ল। রানির চোখে জল এল।

তখন মানিনী ছোটোরানি আট হাজার মানিকের আটগাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশগাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা শখের শাড়ি ধুলোয় ফেলে বললেন—ছাই গহনা! ছাই এ শাড়ি! কোন্ পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ চুড়ি গড়ালে? মহারাজ, কোন্ দেশের ধুলো বালিতে এ মল গড়ালে? ছি ছি, এ কার বাসি মুক্তোর বাসি হার! এ কোন্ রাজকন্যার পরা শাড়ি! দেখলে যে ঘৃণা আসে, পরতে যে লজ্জা হয়! নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা শাড়ি পরা-গহনায় আমার কাজ নেই।

রানি অভিমানে গোসা-ঘরে খিল দিলেন। আর রাজা মলিনমুখে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে কেনা সেই সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে রাজসভায় এলেন।

রাজমন্ত্রী রাজসিংহাসনের এক পাশে, রাজ্যের মাঠ-ঘাট দোকানপাট সন্ধান করে, যাদুকরের দেশের এক বণিকের জাহাজ থেকে, কানা-কড়ি দিয়ে একটি বাঁদরছানা কিনে বসে আছেন।

রাজা এসে বললেন—মন্ত্রীবর, আশ্চর্য হলুম! মাপ দিয়ে ছোটোরানির গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, সে শাড়ি, সে গহনা, রানীর গায়ে হল না।

তখন সেই বনের বানর রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—বড়ো ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে দেবকন্যের হাতে বোনা, নাগকন্যের হাতে গাঁথা, মায়া-রাজ্যের এ মায়া-গহনা, মায়া-শাড়ি, পরতে পায় না। মহারাজ, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখো, যাকে বউ করবে তাকে পরতে দিও।

বানরের কথায় রাজা অবাক হলেন। হাসতে হাসতে মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রী বানরটা বলে কী? ছেলেই হল না, বউ আনব কেমন করে? মন্ত্রী, তুমি স্যাকরার দোকানে ছোটোরানির নতুন গহনা গড়তে দাওগে, তাঁতির তাঁতে রানির শাড়ি বুনতে দাওগে। এ গহনা, এ শাড়ি, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখো; যদি বউ ঘরে আনি তাকে পরতে দেব। রাজমন্ত্রী স্যাকরার দোকানে ছোটোরানির নতুন গহনা গড়াতে গেলেন। আর, রাজা সেই বাঁদর-কোলে বড়োরানির কাছে গেলেন।

দুঃখিনী বড়োরানি, জীর্ণ আঁচলে পা মুছিয়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাজাকে বসতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—মহারাজ, বোসো। আমার এই ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বোসো। আমার আর কী আছে তোমায় বসতে দেব? হায়, মহারাজ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে, আমি এমনি অভাগিনী, তোমার জন্যে ছেঁড়া কাঁথা পেতে দিলুম।

রানির কথায় রাজার চোখে জল এল। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বসে বড়োরানির কোলে বাঁদর-ছানা দিয়ে বললেন—মহারানি, তোমার এ ছেঁড়া কাঁথা ভাঙা ঘর, ছোটোরানির সোনার সিংহাসন, সোনার ঘরের চেয়ে লক্ষগুণে ভালো। তোমার এ ভাঙা ঘরে আদর আছে, যত্ন আছে, দুটো মিষ্টি কথা আছে; সেখানে তাও তো নেই। রানি, সাত জাহাজ সোনা দিয়ে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি দিয়েছি, ছোটোরানি পায়ে ঠেলেছে; আর কানাকড়ি দিয়ে তোমার বাঁদর এনেছি, তুমি আদর করে কোলে নিয়েছ। রানি, আমি আর তোমায় দুঃখ দেব না। এখন বিদায় দাও, আমি আবার আসব রানি। কিন্তু দেখো, ছোটোরানি যেন জানতে না পারে। তোমার কাছে এসেছি শুনলে আর রক্ষে রাখবে না! হয় তোমায়, নয়তো আমায়, বিষ খাওয়াবে।

রাজা বড়োরানিকে প্রবোধ দিয়ে গেলেন। আর বড়োরানি সেই ভাঙা ঘরে দুধকলা দিয়ে সেই বাঁদরের ছানা মানুষ করতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। ছোটোরানির সাতমহলে সাতশো দাসীর মাঝে দিন যায়; আর বড়োরানির ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর-কোলে দিন যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল। বড়োরানির যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল, মোটাচালের ভাত, মোটাসুতোর শাড়ি আর ঘুচল না। বড়োরানি সেই ভাঙাঘরে দুঃখের দুঃখী, সাথের সাথি বনের বানরকে কোলে নিয়ে, ছোটোরানির সাতমহল বাড়ি, সাতখানা ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে কাঁদেন। বানর বড়োরানিকে যখন দেখে তখনই রানির চোখে জল, একটি দিন হাসতে দেখে না।

একদিন বানর বললে—হ্যাঁ মা, তুই কাঁদিস কেন? তোর কীসের দুঃখ? রাজবাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে কেন কাঁদিস, মা? ওখানে তোর কে আছে?

রানি বলেন—ওরে বাছা, ওখানে আমার সব আছে। আমার সাতমহল বাড়ি আছে, সাতশো দাসী আছে, সাত সিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা, ওই সাতমহল বাড়িতে